ছন্দ এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

চৈতালী ব্রহ্ম

কল্লোল যুগের কবিরা যখন পদ্য ছন্দে ছাড়াও গদ্য ছন্দে আধুনিক কবিতা লিখতে শুরু করলেন, কবিতার মোড় ফিরলো নতুনের পথে। তখন 'শ্যামলী' 'পুনশ্চ' শেষ সপ্তকে রবীন্দ্রনাথও গদ্য ছন্দ এবং আধুনিক ভাষাশৈলী নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে শুরু করলেন। মাত্রাবৃত্ত রবীন্দ্রনাথের লেখায় এক ভিন্ন মাত্রা অর্জন করেছিলো। মুক্তক ছন্দে কবি ছন্দের বাঁধা গত ভাঙার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কৃত্তিবাসী যুগে কিন্তু অধিকাংশ কবিতাই গদ্য ছন্দে লেখা, কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কবিরা অনেকেই গদ্যছন্দেই সহজতর হতে লাগলেন।

কিন্তু নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আজীবন ছন্দে বিচরণ করেছেন, ছন্দের জগতে সিংহাসনের অধিকারী হয়েছেন,গদ্যছন্দও তাঁর অবহেলা পায়নি। কবিতা ক্ষেত্রের সব ধরনের ছন্দেই তাঁর ছিলো স্বচ্ছন্দ পদচারণা। ছন্দ চর্চায় এখানেই তিনি থেমে থাকেনি। লিখেছেন ছন্দের বই 'কবিতার ক্লাস' এবং অতি সদর্প উচ্চারণে বলেছেন, 'কেউ কেউ কবি নয়, সকলেই কবি।' প্রকৃতির প্রতিটি চলনে ছন্দ বা ছাঁদ খুঁজে পেয়েছেন তিনি। আর তারপর বাংলার প্রধান তিনটি ছন্দোরীতি অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন তিনি।

'কবিতার ক্লাস' গ্রন্থে তিনি ছন্দ শিক্ষণ শুরু করেছিলেন অক্ষরবৃত্ত ছন্দ দিয়ে। এবং শেষ করেছেন দল,পর্ব,পদ ইত্যাদি ব্যাখ্যা দিয়ে। তাঁর মনে হয়েছে যে মাত্রা বা অক্ষর ব্যাপারটা সর্ব সাধারণের বোঝার পক্ষে সহজ হবে। ক্রমে ক্রমে দল ও দলবৃত্তে গেছেন তিনি। যদিও আমার ব্যক্তিগত অভিমত, অক্ষর আসলে দল বা সিলেবলকেই বোঝায় ছন্দের ক্ষেত্রে, ধ্বনির লিখিত রূপকে নয়। তাই আগে দল, তারপরে মাত্রা এবং ক্রমে পর্ব ও পদ এবং পংক্তি আলোচনা করে নিয়ে পরে দলবৃত্ত ছন্দ থেকে শুরু করলেই ব্যাপারটা আরো সহজ বোধ্য হতে পারতো। অক্ষর বৃত্তের মাত্রাগণনার যে রীতি, তা শুরুতেই আলোচনা করায় খুব

বেশি স্পষ্ট হয়নি।। বরং জীবেন্দ্র সিংহরায়ের 'বাংলা ছন্দ' বইটি সকলের বোঝবার পক্ষে অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত ও সহজ। কিন্তু 'কবিতার ক্লাস বইটিতে নীরেন্দ্রনাথের বাংলা ছন্দ সম্পর্কে ধারণা ও ব্যাখ্যা ক্ষমতা এতটাই বেশি ছিলো যে, যখন লেখাটি পর্বে পর্বে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র রবিবাসরীয় পৃষ্ঠায় 'কবিকঙ্কণ'ছদ্মনামে প্রকাশিত হচ্ছিলো, তখন 'জিজ্ঞাসু পড়ুয়া' ছদ্মনামে শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রী ভবতোষ দত্ত, শ্রী শঙ্খ ঘোষ তাঁকে নিয়মিত পত্রদ্বারা নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন।

কবি জানিয়েছেন-"ছন্দ কিন্তু সবসময়ে চাই। আগেও চাই,পরেও চাই"।

[কবিতার ক্লাস]

"মিল জিনিসটাকে প্রথম অবস্থায় বেশ ভালো করে দখল করা চাই। তবেই সেটাকে ছেড়ে দিয়েও পরে ভাল কবিতা লেখা সম্ভব হবে।"

[ঐ]

তিনি আরো বলেছেন - "ছন্দ আছে সর্বত্র। কুঁড়ে ঘরেও আছে, আবার আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকাতেও আছে।....গাড়ি,বাড়ি,চলা,বলা,মাঠ,নদী,মেঘ, পাহাড়-সব কিছুরই একটা না একটা ছন্দ আছে। আছে কবিতারও। কিন্তু কবিতার ছন্দ বলতে যে কোনও রকমের একটা ছাঁদ বোঝায় না। সেও এরকমের ছাঁদই, তবে কিনা তার নিজস্ব কতকগুলি নিয়মকানুন থাকে।"

[ঐ]

নীরেন্দ্রনাথের ছন্দ শেখানোর পদ্ধতিটি বড়ো মনোহারী, ঘরোয়া চালে। একই বিষয়কে তিনরকম ছন্দের বন্ধনে ধরে দিয়ে তিনটি ছন্দের পার্থক্যটিকে সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন তিনি।

১) অক্ষরবৃত্ত ছন্দে - "দ্যাখো এই পূর্ণচন্দ্র শ্রাবণ আকাশে
স্বর্ণের পাত্রটি যেন শূন্য পরে ভাসে।"

২) মাত্রাবৃত্ত ছন্দে - "আকাশে ছড়ায় পূর্ণ চাঁদের বাণী
শ্রাবণ রাত্রি হাসে
দেখে মনে হয় স্বর্ণ পাত্রখানি
নীল সমুদ্রে ভাসে।"

৩) স্বরবৃত্ত ছন্দে - দ্যাখো দ্যাখো আজকে যেন
শ্রাবণ পূর্ণিমায়
সোনার থালা আটকে আছে
নীল আকাশের গায়।”

এইভাবে প্রাথমিক ভাবে সহজ করে বুঝিয়ে তারপর এক এক করে ছন্দোব্যাখ্যার দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি।

আর নিজের কবিতার ক্ষেত্রে সবরকমের ছন্দকে ব্যবহার করে কবিতা ও ছড়া লিখেছেন তিনি। চল্লিশের উত্তাল রাষ্ট্রবিপ্লব, মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, এই সমস্ত অভিঘাতকে চেতনায় বহন করে নীরেন্দ্রনাথ কালসচেতন কবিই কেবল নয়, হয়ে উঠেছেন ছন্দসচেতন কবি। ছড়াগুলিতে, এমন কি দেশাত্মবোধক ছড়াতে অবলীলাক্রমে তিনি দলবৃত্ত তথা স্বরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করে গভীর সত্যকে বহন করতে পেরেছেন কবিতায়।

দলবৃত্ত কি অসীম গভীর ব্যঞ্জনায় ব্যবহৃত হয়েছে ‘কলকাতার যীশু কাব্যগ্রন্থে ‘দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারে’ কবিতায়-

“দেশ দেখাচ্ছ। অন্ধকারে; ।
এই যে নদী। ওই অরণ্য, । ওইটে পাহাড় ।,
এবং ওইটে । মরুভূমি ।
দেশ দেখাচ্ছ । অন্ধকারের । মধ্যে তুমি, ।
বার করেছ । নতুন খেলা।
শহর গঞ্জ । খেত-খামারে ।
ঘুমিয়ে আছে। দেশটা যখন । রাত্রিবেলা ।
খুলেছ মান । চিত্রখানি ।”

আবার মাত্রাবৃত্তের চার চার ছন্দে অত্যন্ত লঘুচালে ছোটোদের ছড়ায় শিশুদের মন মাতিয়ে দিয়েছেন তিনি-

"একদিন । ছুটি পেলে । শহর পি । ছনে ফেলে ।
জানিস তো । সব্বাই । কোনখানে । যেতে চাই ।
পিকনিকে । বারবার । ডায়মণ্ড । হারবার ।
আর যদি । ছুটি পাই । তিনদিন । তবে ভাই ।
ধর্মত । লার মোড়ে । সরকারি । বাস ধরে ।
সক্কলে । দিই ছুট । দীঘা আর । জুনপুট ।
ছুটি পেলে । এক মাস । রয়েছে র । কেট বাস ।
পথ বারো । ঘন্টার । সেইখানে । যাই যার ।
কাছেই পা । হাড় পুরী । জায়গাটা । শিলিগুড়ি ।"

'অন্ধকার বারান্দা' কাব্যগ্রন্থে 'আবহমান' কবিতায় খানিক মাত্রাবৃত্তের চলন থাকলেও একে স্বরবৃত্তের অন্তর্গত করে উচ্চারণ করাটাই শ্রেয়। তাতে কিন্তু কবিতার ভাব এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় না।

-" যা গিয়ে ওই । উঠানে তোর । দাঁড়া ।
লাউমাচাটার । পাশে ।
ছোট্ট একটা । ফুল দুলছে । ফুল দুলছে । ফুল
সন্ধ্যার বা । তাসে ।
কে এই খানে । এসেছিল । অনেক বছর । আগে ।
কে এইখানে । ঘর বেঁধেছে । নিবিড় অনু । রাগে ।

কবির কবিতা যেমন কালানুক্রমে বাঁকবদল ঘটিয়েছে, তেমনই ছন্দও নানা রূপে রীতিতে তাঁর কবিতায় এক্সপেরিমেন্টাল হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকে কবি লিখছেন (কোনোটি বা পাঁচের দশকে লেখা, 'নীলনির্জন', 'অন্ধকার বারান্দা', 'প্রথম নায়ক', 'নীরক্ত করবী', 'নক্ষত্র জয়ের জন্য', 'কলকাতার যীশু' এই কাব্যগ্রন্থগুলিতে মাত্রাবৃত্ত, দলবৃত্ত এবং অক্ষরবৃত্ত নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয়েছে।

<u>উদাহরণ-মাত্রাবৃত্ত</u>

(১) "বৈশাখের । শুষ্ক তালু । শীতের প্রেত । কাঁপে ।
হাওয়ায় ঝরা । পাতার ঝড় । আকাশে উৎ । সুক ।"

[শেষ বৈশাখ, নীল নির্জন, পাঁচ মাত্রার পর্ব]

(২) "এ কোন যন্ত্রণা | দিবসে তার |
এ কোন যন্ত্রণা | রাতে |
আকাশী স্বপ্ন সে | ছুঁয়েছে তার
মাটিতে গড়া দুই | হাতে |"

[মাটির হাতে, অন্ধকার বারান্দা, সাত মাত্রার পর্ব]

উদাহরণ অক্ষরবৃত্ত

(১) "এই যে অসুস্থ রাত্রি এই |
মুমূর্ষু কামনা বৈশাখের |
সূর্যের প্রহার, মৃত্যু এর |

[গ্রীষ্মের প্রার্থনা, নীল নির্জন, দশ মাত্রার পর্ব]

(২) "কড়া নেড়ে প্রেম চাইতে | ভয় হয়, তবু |
কিছু ভিক্ষা পেলে আমরা | নদীতীরে চলে যেতে পারি |

[নিকেল তোমার জন্য, নক্ষত্র জয়ের জন্য] ৮ | ৬, ৮ | ১০ } মাত্রার পর্ব

উদাহরণ : গদ্যছন্দ-

(১) হুশ করে নক্ষত্রলোকে উঠে যেতে চাই।
কিন্তু তার জন্য মহাশয়,
স্প্রিং লাগানো দারুন মজবুত একটা শব্দের দরকার।
সেইটের উপরে গিয়ে উঠতে হবে।"

[নক্ষত্র জয়ের জন্য নামকবিতা]

(২) "ভালোবাসা থাকলে সব হয়।
দেখো, সব হবে।
যা কিছু বানানো যায়,আমি সব
দুই হাতে
দিনে দিনে বানিয়ে তুলব, তুমি দেখে নিও।

[তুমি দেখে নিও, কলকাতার যীশু] - গদ্যছন্দে লেখা এই কবিতাটি আবৃত্তি করলে পদ্যেরও একটি টান বা চলন লক্ষ্য করা যায়।

এবারে আসা যাক সাতের শেষ থেকে আটের দশকে লেখা কবির কবিতায়

ছন্দোবৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনায়। উলঙ্গ রাজা'র কবিতাগুলি সাতের দশকের শেষে লেখা। সেই সময় এবং তার পরবর্তী কালের কবিতা গুলিও ভীষণভাবে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে লেখা। আর কবির মনে হয়েছে সেগুলি গদ্যছন্দে লিখলে অনেক সুদৃঢ় ভাব তাতে প্রকাশ করা যাবে। তাই তিনি লিখলেন-

(১) "আমার হাতের কাছে টেলিফোন। আমার পায়ের কাছে খেলা করছে। সূর্যমণি মাছেরা। পিচ বাঁধানো সড়কের উপর দিয়ে। নৌকো চালিয়ে আমি। পৃথিবীর তিনভাগ জল থেকে একভাগ ডাঙায় যাব। সেই নৌকোর জন্যে আমি বসে আছি; । আর পাঁচ মিনিট পরপর। ডায়াল ঘুরিয়ে চিৎকার করছি। হ্যালো দমদম--হ্যালো দমদম...হ্যালো দমদম...হ্যালো...

[হ্যালো দমদম, উলঙ্গ রাজা]

(২) "আমার পিছনে কোনো দল নেই, । আমার ভিতরে। দলবদ্ধ হবার আকাঙ্ক্ষা নেই, আমি। সাদা কালো লাল নীল গাং গেরুয়া জাফরান বাদামি। হরেক রঙের খেলা দেখে যাই।"

[আমার ভিতরে কোনো দল নেই, আজ সকালে]

আবার একই সময়ে মাত্রাবৃত্তেও সমান চলমান তিনি।

(১) "গাছের ডালে প্রতীক্ষমাণ তিনটে বুড়ো শকুন।
ওরা জানে,
লোকটা ভূমিশয্যা নেবে এইবারে এই খানে।

[ছবি, আজ সকালে, মাত্রাবৃত্তর মুক্তক ছন্দ]

দলবৃত্তের চটুল ছন্দ কিভাবে গভীর কবিতাকে বাঁধ দিতে পারে তার উদাহরণ এই কবিতাটি-

"তখন যেমন। শূন্যে, তেমনি। গোঁয়ার খ্যাপা। ঝড়ে,
বুক কাঁপে এই। মর্ত লোকের। ঘরেও।
আকাশ যখন। জমিয়ে তোলে। শয়তানি তা। মাশা।
নীচেও তখন। ভাঙে পাখির। বাসা।

[রঙের পাখি, পাগলা ঘন্টি, চার চার মাত্রার ছন্দ]

আটের দশকে প্রকাশিত কবির কাব্য গ্রন্থগুলি হলো 'সময় বড় কম', 'রূপ কাহিনী', 'যাবতীয়-ভালবাসাবাসি', 'ঘুমিয়ে পড়ার আগে', 'জঙ্গলে এক উন্মাদিনী' ইত্যাদি। এর মধ্যে 'রূপকাহিনী' কবির আত্মজীবনভিত্তিক দীর্ঘ দুটি কবিতা নিয়ে গ্রথিত। কোথাও গদ্যছন্দ, আবার কোথাও স্বরবৃত্ত নিয়ে লোফালুফি খেলা,কবিতা এভাবেই গড়ে উঠেছে।

যেমন-ঃ 'শনিবারের রাত্তিরে। বন্ধুর বাড়িতে খুব আড্ডা জমেছিল। সেখানে। কথাটা খুব স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও ।জনৈক জ্যোতিষার্ণব ।তা একরকম জোর করেই আমার ডান-হাত খানাকে তাঁর। কোলের মধ্যে টেনে নিলেন।

আবার একই কবিতায় স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ দেখা যাক-ঃ -

বাদবাকি দিন ।বলতে যে ঠিক। কদিন বাঁচব, ।
সেটাই কি ছাই। জানি? নাকি।
না জানলে আর। চলছে না? দুর।

[রূপ কাহিনী ৪। ৪ স্বরবৃত্ত]

ক্রমে অন্ত্যমিল এবং ছন্দেই কবি আরো স্বচ্ছন্দ হতে লাগলেন এই পর্বে। অবশ্য চিরদিনই তা ছিলেন।

(১) ভুলে গেলে ভাল হত, ।তবু ভোলা গেল না এখনও।
পঁয়ত্রিশ বছর পার ।হয়ে গেছে তবু কোনো কোনো ।
মুহূর্তে তোমাকে মনে পড়ে।

[মনে পড়ে, যাবতীয় ভালবাসাবাসি। ৮। ১০ অক্ষরবৃত্ত]

এমনই আর একটি অন্ত্যমিলময় অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উদাহারণ-ঃ

ন্যাশনাল হাইওয়ের ধারে।
কচুর জঙ্গল আর ।কলাগাছের ঝাড়ে।
উল্টোপাল্টা চিরুনি চা। লিয়ে ওই দ্যাখো।
ছুটে যাচ্ছে হাওয়া।

১০
৮। ৬
৮। ৬
৬
} মাত্রার পর্ব বিন্যাস।

আটের দশকের শঙ্খ ঘোষ এবং আটের দশকের নীরেন্দ্রনাথের ছন্দোবোধের তুলনা প্রতিতুলনায় বলা যায়, নীরেন্দ্রনাথের ছন্দে মারপ্যাঁচ আছে, গদ্যভাবের আধিক্য আছে, অন্ত্যমিল সর্বত্র নেই, কিন্তু তুলনায় 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ', 'প্রহর জোড়া ত্রিতাল, 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে', 'ধূম লেগেছে হৃৎকমলে' কাব্যগ্রন্থের কবি শঙ্খ ঘোষ সুস্পষ্ট বাংলা ত্রিবিধ ছন্দোরীতিরই দ্বারস্থ হয়েছেন এবং অধিকাংশতই অন্ত্যমিলযুক্ত।

উদা : (১) পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ |, রক্তে জল ছলছল করে |
নৌকোর গলুই ভেঙে | উঠে আসে কৃষ্ণা প্রতিপদ |"

৮ | ১০
৮ | ১০ } মহাপয়ার রীতির অক্ষরবৃত্ত

[পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ]

(২) 'তোমার কোনো | ধর্ম নেই, | শুধু | ৫ | ৫ | ২
শিকড় দিয়ে | আঁকড়ে ধরা | ছাড়া | ৫ | ৫ | ২
তোমার কোনো | ধর্ম নেই | শুধু | ৫ | ৫ | ২
বুকের কুঠার | সইতে পারা | ছাড়া | ৫ | ৫ | ২
} মাত্রাবৃত্ত ছন্দ পাঁচ মাত্রার পর্বের

[ত্রিতাল, প্রহরজোড়া ত্রিতাল]

(৩) বাবুদের | লজ্জা হলো |
আমি যে | কুড়িয়ে খাব |
সেটা ঠিক | সইল না আর |
আজ তাই | ধর্মাবতার |
আমি এই | জেলহাজতে |
দেখে নিই | শাঠ্যে শঠে |

[লজ্জা, মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে]

এটি সম্পূর্ণভাবে নজরুল ইসলামের লিচুচোর কবিতার ছন্দানুসরণে লেখা ৪ | ৫ ও ৪ | ৪ মাত্রার পর্বসম্মিলনে অথবা এক মাত্রা ছেড়ে দলবৃত্ত।

আটের দশকে ক্রমাগত গদ্যছন্দে কবিতা লেখার পাশাপাশি অক্ষরবৃত্তকে ইচ্ছে মতো নাড়াচাড়া করেছেন কবি নীরেন্দ্রনাথ। গতানুগতিক অক্ষরবৃত্ত নয়, মুক্তকের মধ্য দিয়ে এই ছন্দকে ধরেছেন তিনি।

- অথচ যা চেয়েছিলে । দেবতার মুঠি ।
তাই রেখে দিয়েছিল । বুড়ি ঠাকুরমার বারান্দায় ।
ছিল না স্বাচ্ছন্দ্য ? ছিল । কাঁকুরে পথে ও কাঁটা ঘাসে ।
তাও সেও পাওয়া ।

৮ । ৬
৮ । ১০
৮ । ১০
৬

} মাত্রার পর্বময় অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

নয়ের দশকে লেখা প্রায় প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ যেমন 'চল্লিশের দিনগুলি','সত্য সেলুকাস', 'অন্য গোপাল', 'জলের জেলখানা থেকে' (এটি অবশ্য একুশ শতকে প্রকাশিত) কাব্যগ্রন্থগুলিতে এক সময় সচেতন সমাজ সচেতন রাজনীতি সচেতন কবিকে খুঁজে পাওয়া যায়। আর দেশ-কাল-জনগণ নিয়ে লিখতে লিখতে কালে কালান্তরে কবির ছন্দভাষা পাল্টাচ্ছে কিনা দেখে নেওয়া যাক। বলা দরকার এখানে কোনো 'রূপকাহিনী' বা 'যাবতীয় ভালবাসাবাসি', বিশেষ চোখে পড়ে না। বরং খুঁজে পাওয়া যায় বারংবার ' কলকাতার যীশু' এবং 'উলঙ্গ রাজার' সেই অনুভূতি প্রবণ প্রতিবাদী মানুষটিকে।

'চল্লিশের দিনগুলি' 'কবিতায় রয়েছে মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, আগস্ট আন্দোলন, দেশভাগ, স্বদেশি লড়াই, সহিংস আন্দোলন, মধ্যবিত্তের জীবনযুদ্ধ, মৃত্যুভয় ইত্যাদি যাবতীয় কঠিন কঠোর ঐতিহাসিক সত্য। আর সেই সত্যকে তুলে ধরার সবচেয়ে উপযুক্ত ভাষা হলো গদ্যভাষা, গদ্যছন্দ। কবি সেই ভাষাতেই লেখেন,

-"মানুষগুলি তখন পোকামাকড়ের মতো মরে যাচ্ছিল। অথচ
সেই মৃত্যু যে কোথাও একটা
আঁচড় পর্যন্ত কাটতে পারছে, চারপাশে তাকিয়ে
এমন কথা কারও মনে হচ্ছিল না।
সে বড় অদ্ভুত এক সময়।"

[চল্লিশের দিনগুলি, নাম কবিতা]

'সত্য সেলুকাস' গ্রন্থেরনাম কবিতাতেও সেই গদ্যছন্দেরই প্রয়োগ দেখা যায়

-" মন্দির না মসজিদ না বিতর্কিত কাঠামো এই
ধুন্ধুমার তর্কের ভিতর থেকে
কানা উঁচু পিতলের থালা বাজাতে বাজাতে
বেরিয়ে এল
পেটে -পিঠে এক হয়ে যাওয়া হাড় জিরজিরে দুটি
লেংটি পরা মানুষ।"

নীরেন্দ্রনাথ বারংবার ছড়ার ছন্দ দলবৃত্তকে গভীর কবিতার ভাব ও ছন্দের প্রকাশেও ব্যবহার করেছেন।

-" ঝড় তুফানের | দিন তো এখন | 8 | 8 মাত্রার পর্ববিশিষ্ট
ভয় লাগানো | রং ধরেছে | 8 | 8 স্বরবৃত্ত বা
আকাশটা;দ্যাখ | ঈশান কোণে | 8 | 8 দলবৃত্ত ছন্দ।
হঠাৎ কেমন | মেঘ করেছে |" 8 | 8

[ঝড় তুফানে,সত্য সেলুকাস]

'সত্য সেলুকাস' কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতাই গদ্যছন্দ ছাড়া মাত্রাবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্তেও লেখা। যেমন 'কখনও কখনও' কবিতাটি অক্ষরবৃত্তে, 'বুঝে নিতে নিতে' অক্ষরবৃত্ত পয়ারে, 'এই দিন এই রাত' ছয়মাত্রার পর্ববিশিষ্ট মাত্রাবৃত্তে, 'ঝুটা মোতি' পাঁচ মাত্রার মাত্রাবৃত্তে, 'মধ্যরাতে' পাঁচ মাত্রার মাত্রাবৃত্তে, 'রক্ত শুধু রক্ত' অক্ষরবৃত্তর মুক্তকে, 'ছন্দ' চার মাত্রার দলবৃত্তে, 'থাকা মানে' অক্ষরবৃত্তে, এবং আরো কবিতাগুলি বিভিন্ন ছন্দে লেখা হয়েছে।

'সন্ধ্যারাতের কবিতা' কাব্যগ্রন্থেও অক্ষরবৃত্ত বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কি - ভাবে অন্ত্যমিল ঘটিয়েছেন দেখে নেওয়া যাক-

"সম্ভবত বিগত জন্মের কিছু সুকৃতির ফলে
কারও কারও ভাগ্যে ঘটে যায়।
ঘটে গেলে এমনি কাঁটা গাছের জঙ্গলে
ফোটে ফুল

হাজামজা নদীর দুকূল
ভাসিয়ে তক্ষুণি আসে আবার জোয়ার।
দিকে দিকে তার
উচ্ছ্বসিত ঢেউএর খবর রটে যায়।" [অক্ষরবৃত্তের মুক্তক]
[তোমাকে দেখেছি তাই]

একুশ শতকেও কবি সমান সমাজসচেতন, ছন্দ সচেতন। সুদীর্ঘ ষাট বছরের কবিতার যাত্রাপথে ছন্দ নিয়ে করে চলেছিলেন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আর তারই ফলশ্রুতি তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির সমস্ত কবিতা। সময়-সমাজ- ও ঘটনা যখনই তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হয়েছে, অবধারিত ছন্দেরও এক্সপেরিমেন্ট করেছেন কবি। উদাহারণ পারাদীপ সিরিজের কবিতাগুলি ' জেলের জেলখানা থেকে' কাব্য গ্রন্থের।

-- " প্রথম শিশুটির জন্মদিন ছিল
আঁধার পারাদীপে কালই
কী পেল দুই হাতে নবজাতক তার,
ভাবছি সেই থেকে খালি। "
পারাদীপ - ১২

একুশ শতকের প্রথম দশক থেকে দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত কবি ক্রমশ বয়সে যেমন অভিজ্ঞ তেমনি - কবিতায় স্পষ্টতার চেয়ে ব্যঞ্জনা বেশি হতে লাগলো। আবার 'ভালবাসা-মন্দবাসা' নিয়ে ভাবেন তিনি তবে তা আর 'যাবতীয় ভালবাসাবাসি' নয় , বাসা অর্থাৎ গৃহের কথা, বাড়ির কথা, মনের বাড়ির কথাও ভাবেন তিনি।

"তুমি তাকে যা-ই ভাবো, সে তা নয় জেনো,
তেমন ছিল না কোনোকালে।
তুমিও তেমন নও, যা-ই সে ভাবুক,
অন্য লোক তুমিও আড়ালে।"
[যে যেমন, 'ভালবাসা মন্দবাসা']

এইভাবে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা কাল ধরে বিশ্লেষণ করলে একটা কথা